بسم اللہ الرحمن الرحیم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ মোতাবেক ২৬ তবলীগ, ১৪০০ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেনঃ

হযরত উসমান (রা.)-এর যুগের বিভিন্ন যুদ্ধ এবং বিজয়াভিজানের বর্ণনা চলছিল। আজ সে বর্ণনাই অব্যাহত থাকবে। আলী বিন মুহাম্মদ মাদায়েনী বর্ণনা করেন যে, তাবারিস্তান-এ হযরত উসমানের যুগে হযরত সাঈদ বিন আস (রা.) ৩০ হিজরী সনে যুদ্ধ করেন এবং দুর্গ জয় করেন। অনুরূপভাবে সওয়ারী বিজয় ৩১ হিজরী সনে হয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়। অধিকাংশ ইতিহাস গ্রন্থে এই যুদ্ধের স্থান সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ নেই। আল্লামা ইবনে খালদূন লিখেছেন যে, এই যুদ্ধ আলেকজান্দ্রিয়ায় হয়েছে। এক বর্ণনামতে ৩১ হিজরী সনে মুসলমানরা রোমবাসীদের সাথে একটি যুদ্ধ করে, যেটিকে সওয়ারী বলা হয়। আবু মা'শার-এর বর্ণনা অনুযায়ী সওয়ারী-র যুদ্ধ সংঘটিত হয় ৩৪ হিজরী সনে আর আসাবেদা-র সামুদ্রিক যুদ্ধ হয় ৩১ হিজরী সনে। ওয়াকদি-র মতে সওয়ারী ও আসাবেদার যুদ্ধ উভয়টি হয়েছে ৩১ হিজরী সনে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সা'দ বিন আবু সারাহ্ যখন ফরাসী ও বার্বারদের আফ্রিকিয়া এবং আন্দালুসিয়ায় পরাস্ত করেন তখন রোমনরা চরম ক্রোধান্বিত হয় এবং সবাই মিলে হিরাক্লিয়াসের পুত্র কনস্টানটিন-এর সাথে একত্রিত হয় এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে এমন এক বাহিনী নিয়ে বের হয় যার দৃষ্টান্ত ইসলামের সূচনা থেকে তখন পর্যন্ত দেখা যায় নি। ৫০০ সামুদ্রিক জাহাজের নৌবহর মুসলমানদের মোকাবিলার জন্য যাত্রা করে। আমীর মুআবিয়া হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সা'দ বিন আবি সারাহ্কে নৌবাহিনীর আমীর নিযুক্ত করেন। উভয় বাহিনীর মাঝে কঠিন যুদ্ধ হয়। অবশেষে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্যে মুসলমানরা বিজয় লাভ করে আর কনস্টানটিন এবং তার অবশিষ্ট বাহিনী পলায়ন করে।

আর্মেনিয়া বিজয় হয় ৩১ হিজরী সনে। ওয়াকদীর উক্তি অনুযায়ী ৩১ হিজরী সনে হাবীব বিন মাসলামা ফেহরী-র হাতে আর্মেনিয়া বিজয় হয়। খোরাসান বিজয়ের বৃত্তান্ত হলো- ৩১ হিজরী সনে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমের খোরাসান-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং আবরাহা শহর, তূস, আবি ওয়ার্দ এবং নাসাহ্ বিজয় করে তিনি সারখাস পর্যন্ত পৌঁছে যান। মারভ্বাসীও এ বছরই সন্ধি করে নেয়। এই মারভ্ তুর্কমেনিস্তান-এ অবস্থিত, বাকি অঞ্চলগুলো ইরানে অবস্থিত। রোম অভিযান সংঘটিত হয় ৩২ হিজরীতে। ৩২ হিজরী সনে আমীর মুআবিয়া রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এমনকি তিনি কনস্টানটিনোপোল-এর দরজায় পৌঁছে যান। মার্ভ রূয, তালেক্বান, ফারিয়াব, জুযাজান এবং তাখারিস্তান বিজয় হয় ৩২ হিজরী সনে। ৩২ হিজরী সনে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমের মারভ্ রূয ও তালেক্বান জয় করেন, যা বর্তমান আফগানিস্তানে বালখ্ ও মারভ্ রূয এর মধ্যবর্তী একটি অঞ্চল। এছাড়া আফগানিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল যেমন ফারিয়াব, জুযাজান, তাখারিস্তান প্রভৃতি অঞ্চলও তিনি জয় করেন।

আবুল আ'শাব সা'দী নিজ পিতার বরাতে বর্ণনা করেন যে, আহনাফ বিন কায়েস-এর মারভ্ রূয, তালেক্বান, ফারিয়াব এবং জুযাজানবাসীদের সাথে রাতের অন্ধকার নেমে আসা পর্যন্ত যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। অবশেষে আল্লাহ্ তা'লা শত্রুদের পরাজিত করেন। আহনাফ বিন

কায়েস আক্বরাহ্ বিন হাবেসকে একটি অশ্বারোহী দলের সাথে জুযাজান-এর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। আকরাহ্কে উক্ত বাহিনীর অবশিষ্ট অংশের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছিল যেটিকে আহনাফ পরাস্ত করেছিলেন। আক্বরাহ্ বিন হাবেস তাদের সাথে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করেন, যাতে তার অশ্বারোহীরাও শহীদ হয়, তথাপি আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের বিজয়ে ভূষিত করেন।

৩২ হিজরীতে বালখ্ বিজিত হয়। আহনাফ বিন কায়েস মরভ্ রূয থেকে বালখ্ অভিমুখে যাত্রা করেন আর সেখানে গিয়ে বালখ্বাসীদের অবরোধ করেন। প্রাচীন বালখ্ ছিল খোরাসানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর আর এটি বর্তমান আফগানিস্তানের সবচেয়ে প্রাচীন শহর। বর্তমানে (এই) প্রাচীন শহরটি ধ্বংসাবশেষ রূপে বিদ্যমান রয়েছে, (আর) বালখ্ নদীর ডান পার্শ্বে ১২ কিলোমিটার দূরত্বে এটি অবস্থিত। সেখানকার বাসিন্দারা চার লক্ষ অংক প্রদানের শর্তে সন্ধির প্রস্তাব দিলে আহনাফ বিন কায়েস তা মেনে নেন।

হারাতের অভিযান পরিচালিত হয়েছিল ৩২ হিজরী সনে, হযরত উসমান (রা.) খুলায়েদ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন হানফী-কে হারাত ও বাযাগীস অভিমুখে প্রেরণ করেন। তিনি এই উভয় (স্থান) জয় করেন কিন্তু পরবর্তীতে তারা বিদ্রোহ করে বসে এবং কারিন বাদশাহ্র সঙ্গ বা পক্ষ অবলম্বন করে। ৩২ হিজরীতে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমের খোরাসানে কায়েস বিন হায়সামকে তার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন আর স্বয়ং সেখান থেকে প্রস্থান করেন। কারিন (বাদশাহ্) মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি বড় সেনাদল গঠন করে রেখেছিল, (তখন) কায়েস বিন হায়সাম আমীরের দায়িত্ব আব্দুল্লাহ্ বিন হাযেম-এর ওপর ন্যস্ত করে সাহায্য ও সেনাশক্তি বৃদ্ধির জন্য আব্দুল্লাহ্ বিন আমের-এর কাছে গমন করেন। প্রতিপক্ষের সেনাসংখ্যা যেহেতু অনেক বেশি ছিল তাই আব্দুল্লাহ্ বিন হাযেম চার হাজার সৈন্যসহ কারিন এর সাথে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। আব্দুল্লাহ্ বিন হাযেম ছয়শ' সৈন্যকে অগ্র-বাহিনী হিসেবে সম্মুখে প্রেরণ করেন আর (তিনি স্বয়ং) তাদের পশ্চাতে রওয়ানা হন। সেই অগ্র-বাহিনী মাঝরাতে কারিন এর সেনাঘাঁটিতে পৌঁছে এবং তাদের ওপর আক্রমণ চালায়। এই অতর্কিত আক্রমণের ফলে শত্রুরা ভীত-ত্রস্ত হয়ে পড়ে। মুসলমানদের অবশিষ্ট সৈন্যরা পৌঁছার পর শত্রুরা চরমভাবে পরাজিত হয় আর কারিন নিহত হয়। মুসলমানরা (শত্রুদের) পশ্চাদ্ধাবন করে আর বহু মানুষকে হত্যা ও গ্রেফতার করে।

হযরত উসমান (রা.)-এর যুগেই পাক-ভারত উপমহাদেশে ইসলাম পৌঁছে গিয়েছিল। ইমাম ইউসুফ কিতাবুল খিরাজ গ্রন্থে ইমাম যোহরী-র বরাতে লিখেছেন যে, হযরত উমর (রা.)-এর যুগে মিশর এবং সিরিয়া বিজিত হয় আর আফ্রিকিয়া, খোরাসান ও সিন্ধুর কিছু অঞ্চল হযরত উসমান (রা.)-এর যুগে বিজিত হয়। উপমহাদেশে ইসলামের আবির্ভাব সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েত এ মর্মে পাওয়া যায় যে, হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মুয়াম্মারকে একটি সেনাদলসহ মাকরান ও সিন্ধু অভিমুখে প্রেরণ করা হয়। মাকরান অভিযানে তিনি পরম বীরত্বের সাক্ষর রাখেন। পরবর্তীতে এর পার্শ্ববর্তী বিজিত অঞ্চলের এমারতের দায়িত্বও তার ওপর অর্পিত হয়। হযরত মুজাশে' বিন মাসঊদ সুলাম্মী সম্পর্কে লিখিত আছে যে, হযরত মুজাশে' বর্তমান আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে একটি ইসলামী সেনাদলের নেতৃত্ব প্রদান করতে গিয়ে ইসলাম বিরোধীদের সাথে জিহাদ করেন। ঐতিহাসিকদের মতে সে যুগে কাবুল ভারবর্ষের অর্ন্তগত ছিল। হযরত মুজাশে' হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশে ইসলাম বিরোধীদের সাথে যুদ্ধ করেন এবং এর সাথে সংযুক্ত অঞ্চল সাজস্তানে (ইসলামের) পতাকা উড্ডীন করেন। এরপর উপমহাদেশের এসব অঞ্চলে মুসলমানরা বসবাস আরম্ভ করে আর এগুলোকে স্বদেশ আখ্যায়িত করে।

হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে নৈরাজ্য সৃষ্টি হওয়া সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণীও রয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, **'হে উসমান! হয়ত আল্লাহ্ তোমাকে একটি কামিজ বা জামা পরিধান করাবেন, মানুষ যদি তোমার কাছে সেই জামা খুলে ফেলার দাবি জানায় তাহলে তুমি তাদের কথায় কখনোই সেই জামা খুলবে না।'** এটি তিরমিযীর হাদীস। সুনান ইবনে মাজাহ্'তে এই রেওয়ায়েতটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, হে উসমান! আল্লাহ্ তা'লা যদি কোনদিন এই দায়িত্ব তোমার ওপর অর্পণ করেন আর মুনাফিকরা তোমার কাছে সেই কামিজ খুলে ফেলার দাবি করে যা আল্লাহ্ তোমাকে পরিধান করিয়েছেন, তাহলে তুমি তা খুলবে না। তিনি (সা.) তিনবার এ কথা বলেন। রেওয়ায়েত বর্ণনাকারী নো'মান বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে নিবেদন করি যে, এ বিষয়টি মানুষকে জানাতে আপনাকে কিসে বিরত রেখেছে? হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি এই বিষয়টি ভুলে গিয়েছিলাম।

হযরত কা'ব বিন উজ্রাহ্ বর্ণনা করেন যে, (একবার) মহানবী (সা.) সন্নিকটবর্তী একটি ফিত্না বা নৈরাজ্যের কথা উল্লেখ করেন। তিনি (সা.) যখন এ কথা বলছিলেন তখন এক ব্যক্তি পাশ দিয়ে যায় যার মাথা ঢাকা ছিল এবং শরীর চাদরে আবৃত ছিল। মহানবী (সা.) বলেন, যেদিন এই নৈরাজ্য দেখা দিবে সেদিন এই ব্যক্তি হেদায়েতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি ছুটে সেই ব্যক্তির কাছে যাই। তখন দেখতে পাই যে, তিনি হলেন হযরত উসমান (রা.)। আমি তাকে দুহাতে ধরে রাখি। অতঃপর আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করি যে, ইনিই কি সেই ব্যক্তি? মহানবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ, ইনি-ই। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজ অসুস্থতার সময় বলেন, আমি কতক সাহাবীকে আমার কাছে পেতে চাই। আমরা নিবেদন করি, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমরা কি আপনার কাছে হযরত আবু বকর (রা.)-কে ডেকে আনব? তিনি (সা.) নীরব থাকেন। এরপর আমরা বলি, আমরা কি আপনার কাছে হযরত উমর (রা.)-কে ডেকে আনব? এতেও তিনি (সা.) নীরব থাকেন। এরপর আমরা বলি, আমরা কি আপনার কাছে হযরত উসমান (রা.)-কে ডেকে আনব? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ। (অতএব) তিনি আসেন এবং মহানবী (সা.) তার সাথে একাকীত্বে সাক্ষাৎ করেন এবং আলাপচারিতায় রত হন। তখন হযরত উসমান (রা.)-এর মুখমণ্ডলের রং পরিবর্তন হচ্ছিল। কায়েস বর্ণনা করেন যে, আমার নিকট হযরত উসমান (রা.)-এর মুক্ত ক্রীতদাস আবু সাহ্লা বর্ণনা করেন যে, হযরত উসমান বিন আফ্ফান (রা.) 'ইয়ামুদ্ দ্বার'-এ বা গৃহবন্দী থাকা অবস্থায় বলেন যে, মহানবী (সা.) আমাকে একটি তাগিদপূর্ণ নির্দেশ প্রদান করেছিলেন আর আমি সে পথেই যাচ্ছি। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত উসমান (রা.) তখন বলেন **'আনা সাবেরুন আলাইহে'** অর্থাৎ আমি এর ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। 'ইয়ামুদ্ দ্বার' সেই দিনকে বলা হয় যেদিন হযরত উসমান (রা.)-কে মুনাফেকরা তার ঘরে অবরোধ করেছিল এবং এরপর অত্যন্ত নির্মমভাবে শহীদ করেছিল।

হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে মতানৈক্যের সূচনা এবং এর কারণ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বিশদ আলোচনা করেছেন। তিনি (রা.) বলেন,

হযরত উসমান এবং হযরত আলী দুজনেই ইসলামের প্রারম্ভিক নিবেদিতপ্রাণ লোকদের অন্তর্ভুক্ত আর তাদের সঙ্গীরাও ইসলামের সর্বোত্তম ফসল ছিলেন। তাঁদের সততা এবং খোদাভীতির ওপর অপবাদ আরোপ করা মূলত ইসলামের প্রতি কলঙ্ক আরোপের শামিল। আর যে মুসলমানই ন্যায়পরায়ণতার সাথে এই বিষয়ে প্রণিধান করবে সে এটি মানতে বাধ্য হবে যে, প্রকৃত পক্ষে এসব পুণ্যবান লোক সকল ধরনের দলাদলির ঊর্ধ্বে ছিলেন। আর এ কথা প্রমাণহীন নয়, বরং ইতিহাসের পাতা সেই ব্যক্তির জন্য এ বিষয়ে সাক্ষী যে নিরপেক্ষ

দৃষ্টিতে এগুলো অধ্যয়ন করে। আমার গবেষণা অনুযায়ী উক্ত বুযুর্গদের এবং তাদের মিত্রদের ব্যাপারে যা কিছু বর্ণনা করা হয় তা ইসলামের শত্রুদের ষড়যন্ত্র মাত্র। যদিও সাহাবীদের মৃত্যুর পর কতক মুসলমান নামধারীরাও স্বার্থান্ধ হয়ে এই বুযুর্গদের একজন বা অপরজনের ওপর অপবাদ আরোপ করেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সত্য সর্বদা জয়লাভ করেছে এবং বাস্তবতা কখনো পর্দার আড়ালে চাপা থাকে নি।

উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে সৃষ্ট নৈরাজ্য সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, প্রশ্ন হলো, এই নৈরাজ্যের সূচনা কোথায়? কেউ কেউ হযরত উসমান (রা.)-কে এর কারণ আখ্যা দিয়েছে, আবার কেউ কেউ হযরত আলীকে (কারণ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে)। কেউ কেউ বলে যে, হযরত উসমান কতিপয় বিদআতের প্রচলন করেছিলেন, যার কারণে মুসলমানদের মাঝে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল। কেউ কেউ বলে, হযরত আলী (রা.) খিলাফতের লোভে গোপন ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেন আর হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিরোধিতা সৃষ্টি করে তাঁকে হত্যা করিয়েছেন- যেন স্বয়ং খলীফা হতে পারেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, প্রকৃত বিষয় হলো, উভয় অভিযোগই ভুল। না হযরত উসমান (রা.) কোন বিদআতের সূচনা করেছিলেন আর না হযরত আলী (রা.) খলীফা হওয়ার লোভে তাঁকে হত্যা করিয়েছিলেন অথবা তাঁকে হত্যার মিশনে জড়িত ছিলেন, বরং এই নৈরাজ্যের হেতু ছিল ভিন্ন কিছু। হযরত উসমান (রা.) এবং হযরত আলী (রা.) উভয়ের আঁচল এহেন অভিযোগ থেকে পরিপূর্ণরূপে পবিত্র ছিল। তাঁরা (উভয়ে) অতিব পবিত্র মানুষ ছিলেন। হযরত উসমান (রা.) হলেন সেই ব্যক্তি, যাঁর সম্পর্কে স্বয়ং মহানবী (সা.) বলেন, তিনি (রা.) ইসলামের এত সেবা করেছেন যে, এখন তিনি যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারেন, আল্লাহ্ তা'লা তাকে জবাবদিহি করবেন না। এটি তিরমিযিতে বর্ণীত হাদীস। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, উক্ত বাক্যের অর্থ এটি নয় যে, তিনি (রা.) ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করলেও শাস্তিযোগ্য সাব্যস্ত হবেন না বরং উক্ত বাক্যের অর্থ হলো, তাঁর (রা.) মাঝে এত গুণাবলী সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি পুণ্যে এতটাই উৎকর্ষ অর্জন করেছিলেন যে, আল্লাহ্ তা'লার আদেশের বাইরে তিনি কোন কাজ করবেন- তা মোটেই সম্ভব ছিল না। অতএব হযরত উসমান (রা.) শরিয়ত পরিপন্থী কোন বিষয় প্রচলন করার মানুষ ছিলেন না আর না হযরত আলী এমন ব্যক্তি ছিলেন যে, খিলাফতের লোভে কোন গোপন ষড়যন্ত্র করবেন। এরপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালের প্রারম্ভিক ৬ বছর পর্যন্ত আমরা কোনরূপ নৈরাজ্য দেখতে পাই না, বরং মানুষ মোটের ওপর তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিল বলেই জানা যায়। অধিকন্তু ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, সেই সময়ে তিনি হযরত উমর (রা.)-এর তুলনায় জনগনের কাছে অধিক প্রিয় ছিলেন। অর্থাৎ হযরত উসমান (রা.) হযরত উমর (রা.)-এর চেয়ে মানুষের কাছে অধিক প্রিয় ছিলেন আর কেবল প্রিয়-ই ছিলেন না বরং জনগনের হৃদয়ে তাঁর (রা.) প্রতাপও বিরাজমান ছিল, যেমনটি সমসাময়িক (একজন) কবি নিজ কবিতায় এর সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং বলেছেন, হে পাপাচারিরা! উসমানের রাজত্বে মানুষের সহায়-সম্পদ লুটেপুটে খেও না, কেননা ইবনে আফ্ফান হলেন সেই ব্যক্তি, যার সম্পর্কে তোমরা পূর্বেই অভিজ্ঞতা করেছ। তিনি (রা.) লুটেরাদের কুরআনের নীতিতে বধ করেন আর সদাসর্বদা পবিত্র কুরআনের সুরক্ষাকারী এবং মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এর (তথা কুরআনের) বিধান বলবৎকারী। কিন্তু (দুর্ভাগ্যজনকভাবে) ছয় বছর পর সপ্তম বছরে আমরা এক আন্দোলন প্রত্যক্ষ করি আর সেই আন্দোলন হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে নয়, বরং তা ছিল হয় সাহাবীদের বিরুদ্ধে নতুবা কতিপয় গভর্ণরের বিরুদ্ধে। যেমন তাবারী বর্ণনা করেন, হযরত উসমান (রা.) মানুষের অধিকার সংরক্ষণ সম্পর্কে পুরোপুরি যত্নবান ছিলেন, কিন্তু ঐ সকল লোক, যারা ইসলামে প্রবীন ও প্রথম সারির গণ্য হতো না, আর তারা প্রবীন মুসলমানদের

ন্যায় মজলিস বা বৈঠকগুলোতে সম্মানও পেতো না আর শাসন ব্যবস্থায়ও তারা সমপরিমাণ অংশ পেতো না এবং সম্পদেও তাদের সমান অংশ থাকত না। কিছুদিন পর কতিপয় লোক এই প্রাধান্যের কারণে কঠোর পন্থা অবলম্বন করে এবং এটিকে অন্যায় আখ্যা দিতে থাকে, কিন্তু তারা সাধারণ মুসলমানদেরকে ভয়-ও পেত আর সর্বসাধারণ তাদের বিরোধিতা করতে পারে- এই আশঙ্কায় নিজেদের চিন্তাধারা (জনসম্মুখে) প্রকাশ করতো না বরং তারা যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল তা হলো, সঙ্গোপনে সাহাবীদের বিরুদ্ধে জনমনে উত্তেজনা ছড়াত আর যখনই কোন অজ্ঞ মুসলমান অথবা কোন মুক্ত মরুবাসী দাস পেত, তখন তাদের সম্মুখে নিজেদের অভিযোগের ফিরিস্তি তুলে ধরত, ফলে অজ্ঞতা বশত অথবা সম্মান লাভের মানসে কতিপয় লোক তাদের দলে যোগ দিত আর ধীরে ধীরে এই দলের লোকবল ভারি হতে থাকে এবং (অবশেষে) তা বৃহদাকার দলে পরিণত হয়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, যখন কোন নৈরাজ্য মাথা চাড়া দেয়ার থাকে, তখন নৈরাজ্যের উপকরণও অসাধারণভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। একদিকে কতিপয় হিংসুটে প্রকৃতির লোকের মাঝে সাহাবীদের বিরুদ্ধে উত্তেজনা সৃষ্টি হতে থাকে, অপরদিকে সেই ইসলামী আবেগউচ্ছ্বাস- যা ধর্ম পরিবর্তনকারী নবদীক্ষিত প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে থেকে থাকে, তা ঐসকল নবমুসলিমের হৃদয় থেকে উবে যেতে থাকে যারা না মহানবী (সা.)-এর সাহচর্য লাভ করেছিল আর না তাঁর (সা.) সাহচর্যলাভকারী ব্যক্তিদের পাশে বসার তেমন একটা সুযোগ তাদের হয়েছিল। বরং ইসলাম গ্রহণ করা মাত্রই তারা ধারণা করে নিয়েছিল যে, তারা সব কিছু শিখে গেছে। ইসলামের প্রতি (তাদের) আবেগউচ্ছ্বাস হ্রাস পাওয়া মাত্রই ইসলামের সেই প্রভাব, যা তাদের হৃদয়ে ছিল, তা-ও হ্রাস পায় আর তারা সেই সমস্ত পাপকর্মে আনন্দ অনুভব করতে আরম্ভ করে যাতে তারা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে নিপতিত ছিল। তাদের অপরাধের দরুন তারা শাস্তিপ্রাপ্ত হয়; কিন্তু (নিজেদের) সংশোধনের পরিবর্তে শাস্তিপ্রদানকারীদের অনিষ্ট সাধনে উদ্যত হয়। আর অবশেষে ইসলামী ঐক্যের পথে এক বড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির কারণ হয়। তাদের কেন্দ্র যদিও কুফায় ছিল, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, স্বয়ং মদীনা মুনাওওয়ারায় এমন একটি ঘটনা সংঘটিত হয় যা দ্বারা বুঝা যায় যে, সেই সময়ে কিছু লোক ইসলাম সম্পর্কে ঠিক সেরূপই অনবহিত ছিল যেরূপ আজকাল গভীর অমানিশায় বসবাসকারী কতিপয় অজ্ঞ লোক হয়ে থাকে।

হোমরান ইবনে আওয়ান নামের এক ব্যক্তি ছিল যে এক নারীকে তার ইদ্দত পালনকালীন সময়েই বিয়ে করে ফেলে। যখন হযরত উসমান (রা.) এ সম্পর্কে জানতে পারেন, তখন তিনি (রা.) তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং সেই মহিলাকে তার থেকে পৃথক করে দেন। অধিকন্তু তাকে দেশান্তর করে বসরায় পাঠিয়ে দেন। সেই সময় প্রতিভাত হয় যে, কতিপয় লোক শুধুমাত্র ইসলাম গ্রহণ করে নিজেদেরকে ইসলামের আলেম জ্ঞান করতে শুরু করেছিল। আর অধিক গবেষণার প্রয়োজন আছে বলে মনে করত না অথবা বিভিন্ন অবৈধ চিন্তাধারার অধীনে শরীয়ত অনুযায়ী আমল করাকে একটি বৃথা কর্ম জ্ঞান করত। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, সত্য কথা হলো, এসব উন্মাদনা গোপন ষড়যন্ত্রের-ই ফলাফল ছিল। এর মূল হোতা ছিল ইহুদিরা, যাদের সাথে কতিপয় জগৎপূজারী মুসলমান যোগ দিয়েছেল, যারা ধর্মচ্যুত হয়ে গিয়েছিল। নতুবা বিভিন্ন অঞ্চলের আমীরদের কোন অপরাধ ছিল না, আর না তারা এই নৈরাজ্যের জন্য দায়ী ছিলেন। কতিপয় ইহুদী এর মূল হোতা ছিল এবং তাদের সাথে কতিপয় মুসলমানও যুক্ত হয়ে যায়। যা-হোক, হযরত উসমান (রা.) এর পক্ষ থেকে যে সকল আমীর নিযুক্ত করা হয়েছিল তাদের কোন অপরাধ ছিল না, আর তারা এই নৈরাজ্যের জন্য দায়ীও ছিলেন না। তাদের অপরাধ শুধু এতটুকুই ছিল যে, তাদেরকে হযরত উসমান (রা.) এই কাজের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন আর হযরত উসমানের অপরাধ এটি ছিল যে, তিনি বার্ধক্য এবং শারীরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও ইসলামী ঐক্যের রজ্জু নিজের হাতে

ধরে রেখেছিলেন এবং মুসলিম উম্মতের বোঝা তিনি নিজের কাঁধে বহন করছিলেন, ইসলামী শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য চিন্তিত ছিলেন এবং বিদ্রোহী ও জালেমদের তাদের নিজেদের আকাঙ্খা অনুযায়ী দুর্বল এবং অসহায় লোকদের উপর জুলুম ও অত্যাচার করতে দিতেন না। যেমন এই বিষয়টির সত্যায়ন এ ঘটনার মাধ্যমেও হয় যে, কুফায় এই নৈরাজ্যবাদীদের একটি বৈঠক বসে। এতে আমীরুল মু'মিনিন এর অপসারনের বিষয়ে কথা হয় আর মানুষ তখন সর্বসম্মতভাবে এই মতামত দেয় যে, **'লা ওয়াল্লাহে লা ইয়ারফাউ রা'সান মাদামা উসমানা আলান্নাস'**। অর্থাৎ কোন মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত মাথা তুলতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত উসমান এর শাসন রয়েছে। উসমান সেই এক সত্তা ছিলেন যিনি বিদ্রোহ থেকে বিরত রেখেছিলেন, তাই তাঁকে সরিয়ে দেয়া আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়, যেন তারা নিজেদের বাসনা পূর্ণ করতে পারে। এই নৈরাজ্য সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, তিনি সে সকল নৈরাজ্যবাদীদের ডাকেন এবং মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদেরও একত্র করেন। সকলে একত্রিত হলে তিনি তাদের পুরো অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেন এবং সেই দু'জন গুপ্ত সংবাদদাতাও সাক্ষী হিসেবে দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দেয় যারা হযরত উসমান (রা.) কে সংবাদ দিয়েছিল যে, নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীরা কি ধরনের নৈরাজ্য সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। তখন সকল সাহাবী এই ফতোয়া দেন যে, তাদেরকে হত্যা করা হোক। তারা নৈরাজ্যবাদী- যারা সংশোধনের নামে নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে। তাদেরকে হত্যা করা হোক, কেননা মহানবী (সা.) বলেছেন, কোন ইমাম বিদ্যমান থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তি নিজের আনুগত্য বা অন্য কারো আনুগত্যের জন্য মানুষকে ডাকে, তার প্রতি খোদা তা'লার অভিসম্পাত। তোমরা এমন ব্যক্তিকে হত্যা কর, সে যে-ই হোক না কেন। আর হযরত উমর (রা.)-এর (রা.) বক্তব্য স্মরণ করান যে, (এটি মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েত) এমন কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা আমি তোমাদের জন্য বৈধ মনে করি না যাতে আমি অংশীদার নই। অর্থাৎ রাষ্ট্রের অনুমতি বা ইশারা ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা বৈধ নয়। হযরত উসমান (রা.) সাহাবীদের ফতোয়া শুনে বলেন, না! আমরা তাদেরকে ক্ষমা করব, তাদের অজুহাত গ্রহণ করব এবং নিজেদের সমস্ত চেষ্টা দ্বারা তাদেরকে বুঝাব এবং কোন ব্যক্তির বিরোধিতা করব না; যতক্ষণ না তারা শরীয়ত নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করে অথবা কুফরী করে। এরপর বলেন, তারা কিছু কথা বলেছে যা তোমরাও জান। তাদের ধারণা হলো, তারা এ বিষয়গুলো নিয়ে আমার সাথে বিতর্ক করবে যেন ফিরে গিয়ে বলতে পারে যে, আমরা এসব বিষয়ে হযরত উসমান (রা.) এর সাথে বিতর্ক করেছি এবং তিনি হেরে গেছেন। তারা বলে, তিনি অর্থাৎ হযরত উসমান (রা.) সফরে পুরো নামায পড়েছেন। একটি সফরে আমি মক্কায় পুরো নামায আদায় করেছি অথচ মহানবী (সা.) সফরে নামায কসর করতেন। হযরত উসমান (রা.) বলেন, কিন্তু আমি শুধু মিনায় পুরো নামায পড়েছি। আর তা-ও দুটি কারণে। প্রথমত, সেখানে আমার সম্পত্তি রয়েছে আর সেখানে আমি বিয়ে করেছি। দ্বিতীয়ত, আমি জানতাম চতুর্দিক থেকে মানুষ সেই দিনগুলোতে হজ্জ করার উদ্দেশ্যে এসেছে। তাদের মাঝে অজ্ঞরা বলা আরম্ভ করবে যে, খলীফা দুই রাকাত পড়েন, তাই নামায দুই রাকাতই হবে। হযরত উসমান (রা.) সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে, এ কথাটি কি সঠিক নয়? সাহাবীরা উত্তর দেন, হ্যাঁ! সঠিক। এরপর হযরত উসমান (রা.) বলেন, দ্বিতীয় আপত্তি এটা আরোপ করে যে, আমি চারণভূমি নির্ধারণ করার বিদআতের সূচনা করেছি। অথচ এ আপত্তি ভুল। চারণভূমি আমার পূর্বেই নির্ধারণ করা হয়েছিল। হযরত উমর (রা.) এর সূচনা করেছিলেন। আর আমি শুধু সদকার উটের আধিক্যের কারণে একে বিস্তৃত করেছি। যেটি সরকারী চারণভূমি ছিল, যেখানে পশু রাখা হতো সেটা বিস্তৃত করেছি। এছাড়া চারণভূমিতে যে জমি ব্যবহার করা হয়েছে সেটি কারো (ব্যক্তিগত) সম্পদ নয়; সরকারি জমি ছিল। আর এতে আমার কোন স্বার্থও ছিল না। আমার তো শুধু দুটি উট রয়েছে; অথচ আমি

যখন খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলাম তখন সমগ্র আরবে আমি সবচেয়ে বড় ধনী ছিলাম। এখন শুধু দুটি উট রয়েছে যা হজ্জের জন্য রাখা হয়েছে। এটি কি সঠিক নয়? সাহাবীরা নিবেদন করেন, জ্বি, সঠিক। এরপর হযরত উসমান (রা.) বলেন, তারা বলে (তিনি) যুবকদের গভর্নর নিযুক্ত করেন। অথচ আমি এমন লোকদের গভর্নর নিযুক্ত করি যারা সৎ গুণাবলীর অধিকারী ও সৎ আচার ব্যবহার করে। আর আমার পূর্বের বুযুর্গরা আমার নিযুক্ত গর্ভনরদের চেয়েও কম বয়সী লোকদের গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। আর মহানবী (সা.)-এর ওপর উসামা বিন যায়েদ (রা.)-কে সেনাপতি নিযুক্ত করার কারণে এরচেয়েও বেশি আপত্তি করা হয়েছিল; যা এখন আমার ওপর করা হচ্ছে। এটি কি সঠিক নয়? সাহাবীরা বলেন, হ্যাঁ, সঠিক। হযরত উসমান বলেন, এরা মানুষের সামনে ত্রুটি তো বর্ণনা করে কিন্তু সঠিক ঘটনা বর্ণনা করে না। এভাবেই হযরত উসমান (রা.) সমস্ত আপত্তি এক একটি করে বর্ণনা করেন এবং সেগুলোর উত্তর দেন। সাহাবীরা বারবার এ কথার ওপর জোর দেন যে, এসব বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের হত্যা করা হোক। কিন্তু হযরত উসমান (রা.) তাদের এ কথা মানেন নি এবং তাদেরকে ছেড়ে দেন। তাবারী বলেন, **'আবাল মুসলিমুনা ইল্লা কাতলাহুম ওয়া আবা ইল্লা তরকাহু'** অর্থাৎ, অবশিষ্ট সকল মুসলমান তো এদের হত্যা ব্যতীত অন্য কোন কিছুতে রাজি ছিল না, কিন্তু হযরত উসমান (রা.) শাস্তি দিতে কোনভাবেই প্রস্তুত ছিলেন না। এ ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীরা কোন্ কোন্ ধরনের ধোঁকা ও প্রতারণা করতো। সে যুগে যখন প্রেস এবং ভ্রমণের জন্য সেরূপ ব্যবস্থা ছিল না যা এখন রয়েছে; তাদের জন্য অজ্ঞ লোকদের পথভ্রষ্ট করা কতই না সহজ ছিল! প্রকৃতপক্ষে এদের কাছে নৈরাজ্য সৃষ্টির যৌক্তিক কোন কারণ ছিল না আর সত্য তাদের পক্ষে ছিল না এবং তারাও সততার পথে ছিল না। তাদের সকল কর্মকাণ্ডের ভিত্তি ছিল মিথ্যা ও ভ্রান্তির ওপর। শুধু হযরত উসমান (রা.)-এর অনুকম্পাই তাদের বাঁচিয়ে রেখেছিল, অন্যথায় সাধারণ মুসলমানরা তাদেরকে টুকরো টুকরো করে ফেলতো। সাহাবীরা এবং প্রবীণ মুসলমানরা কখনোই সহ্য করতে পারতেন না যে, সেই শান্তি ও নিরাপত্তা, যা তারা নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে অর্জন করেছিলেন, কতিপয় দুষ্কৃতকারীর দুষ্কৃতির ফলে এভাবে বিনষ্ট হবে। তারা দেখছিলেন যে, এমন লোকদের শীঘ্রই শাস্তি দেয়া না হলে ইসলামী সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু হযরত উসমান (রা.) ছিলেন মূর্তিমান দয়া, তিনি চাচ্ছিলেন যেকোনভাবে হোক এরা যেন হেদায়েত পেয়ে যায় এবং কুফরীতে মৃত্যুবরণ না করে। এভাবে তিনি তাদেরকে অবকাশ দিতেন আর তাদের প্রকাশ্য বিদ্রোহাত্মক কর্মকাণ্ডকে নিছক বিদ্রোহের ইচ্ছা আখ্যা দিয়ে শাস্তি পিছিয়ে দিতেন। এ ঘটনা থেকে এটিও বুঝা যায় যে, সাহাবীরা তাদেরকে চরমভাবে ঘৃণা করতেন বা তাদের প্রতি একেবারেই বীতশ্রদ্ধ ছিলেন, কেননা প্রথমত, তারা বলেছে যে, কেবল তিনজন মদিনাবাসী আমাদের সাথে আছে অর্থাৎ নৈরাজ্যবাদীরা মদিনার কেবল তিনজনের নাম বলেছে যারা তাদের সাথে ছিল, এর অধিক নয়। অন্যান্য সাহাবীরাও যদি তাদের সাথে থাকতেন তাহলে তারা তাদের নামও উল্লেখ করত। দ্বিতীয়ত, সাহাবীরা নিজেদের কর্মের মাধ্যমে এটিও প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, তারা নৈরাজ্যবাদীদের কার্যকলাপকে ঘৃণা করতেন। শুধু তাই নয়, তাদের কর্মকাণ্ডকে তারা এমনই শরীয়ত পরিপন্থী জ্ঞান করতেন যে, এই অপরাধে মৃত্যুদণ্ডের চেয়ে লঘু কোন শাস্তি তারা বৈধই মনে করতেন না। সাহাবীরা যদি তাদের সাথে থাকতেন বা মদিনাবাসীরা যদি তাদের সমমনা হতো তাহলে অন্য কোন বাহানা করার তাদের কোন প্রয়োজনই ছিল না। মদিনার আরো অনেক লোক যদি তাদের সাথে থাকত তাহলে তারা তখনই হযরত উসমান (রা.)-কে হত্যা করত এবং তাঁর স্থলে অন্য কাউকে খিলাফতের জন্য বেঁছে নিত। কিন্তু আমরা দেখি, এরা শুধু হযরত উসমান (রা.)-কে হত্যা করতেই ব্যর্থ হয় নি বরং স্বয়ং তাদের প্রাণ সাহাবীদের নগ্ন তরবারির হুমকির মুখে পড়ে গিয়েছিল। আর শুধুমাত্র এই কৃপালু ও দয়ালু ব্যক্তিত্বের প্রাণভিক্ষা

ও অনুগ্রহে তারা প্রাণে রক্ষা পেয়ে ফিরে যেতে পেরেছে যাকে তারা হত্যা করার সংকল্প করেছিল এবং যার বিরুদ্ধে তারা এমন নৈরাজ্য সৃষ্টি করছিল। এই নৈরাজ্যবাদীদের বিদ্বেষ এবং তাকওয়াশূন্যতা দেখে অবাক হতে হয়। এই ঘটনা থেকে তারা সামান্যতম উপকৃত হয় নি। তাদের প্রতিটি আপত্তির যথার্থ উত্তর প্রদান করা হয়েছে আর তাদের সকল অভিযোগ ভুল এবং ভিত্তিহীন প্রমাণিত করা হয়েছে। তারা হযরত উসমান (রা.)-এর কৃপা ও দয়া দেখেছে আর তাদের প্রত্যেকের প্রাণ এ সাক্ষ্য দিচ্ছিল যে, এখন ভূপৃষ্ঠে এ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না, তিনি এতই দয়ালু ছিলেন! কিন্তু তারা তাদের পাপ থেকে তওবা না করে, অন্যায়ে অনুশোচনা না করে, নিজেদের দোষ-ক্রটিতে অনুতপ্ত না হয়ে এবং নিজেদের দুষ্কৃতি পরিত্যাগ না করে ক্রোধ ও ক্ষোভের আগুনে আরো বেশি দগ্ধ হতে থাকে। আর তাদের নিরুত্তর হওয়াকে নিজেদের জন্য লাঞ্ছনা মনে করে এবং হযরত উসমান (রা.)-এর ক্ষমাকেও নিজেদের চমৎকার ষড়যন্ত্রের ফসল জ্ঞান করে নিজেদের ভবিষ্যত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কথা চিন্তা করতে করতে ফিরে যায়। ঘটনাপ্রবাহ এখনও অব্যাহত আছে- ইনশাআল্লাহ্ অবশিষ্টাংশ পরবর্তীতে উপস্থাপন করা হবে।

এখন আমি বিগত দিনগুলোতে মৃত্যুবরণ করেছেন এমন কতিপয় প্রয়াত ব্যক্তিবর্গের স্মৃতিচারণ করতে চাই। এদের মধ্যে সর্বপ্রথম রয়েছেন একজন শহীদ, তিনি হলেন পেশোয়ার-এর বশীর আহমদ বাযীদখেল নিবাসী আব্দুল কাদের সাহেব। তিনি গত ১১ ফেব্রুয়ারি তারিখে শাহাদাত বরণ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। প্রাপ্ত সংবাদ অনুসারে, আব্দুল কাদের সাহেব পেশোয়ারের বাযীদখেলে অবস্থিত তার চাচা ডাক্তার মঞ্জুর আহমদ সাহেবের ক্লিনিকে কাজ করতেন। মরহুম শহীদ ক্লিনিকে উপস্থিত জামা'তের অন্যান্য আহমদী বন্ধুদের সাথে যোহরের নামায আদায়ের জন্য একটি কক্ষে সমবেত ছিলেন। তখন রোগীদের দিকের কক্ষ থেকে বেল বাজানো হয় এতে আব্দুল কাদের সাহেব দরজা খুলেন। তখন রোগীর বেশে উপস্থিত এক যুবক তাকে লক্ষ্য করে গুলি করে, ফলে মরহুম শহীদ গুরুতর আহত হন। তার বুকে দু'টি গুলি লাগে। তৎক্ষনাৎ তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু আঘাত সহ্য করতে না পেরে আব্দুল কাদের সাহেব শহীদ হন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। শহীদ মরহুমের বয়স ছিল ৬৫ বছর। যাহোক, পুলিশ হত্যাকারীকে গ্রেফতার করেছে অথবা মানুষ ধরে পুলিশের কাছে সপোর্দ করেছে। মরহুম শহীদের পরিবারও অন্যান্য আহমদী পরিবারের মতো দীর্ঘদিন থেকে তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন ছিল। ১৯ জানুয়ারি ২০০৯ তারিখে ধর্মীয় চরমপন্থীরা এই ক্লিনিকেই আক্রমণ করেছিল। যার ফলে জনাব আব্দুল কাদের সাহেবের পায়ে গুলি লেগেছিল। এ কারণে তিনি পেশোয়ার থেকে হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং দীর্ঘকাল পর পেশোয়ার গিয়ে পুনরায় বসতি স্থাপন করতে সক্ষম হন। সাম্প্রতিক বিরোধিতার ঢেউয়ের ফলে প্রায় দুই মাস পূর্বে জামা'তের নির্দেশে পুনরায় রাবওয়ায় হিজরত করতে বাধ্য হন। বর্তমানে তার পরিবার রাবওয়াতেই আছে। তথাপি, প্রয়াত শহীদ নিজে চাকরির কারণে বাযিদখিলের উল্লিখিত ক্লিনিকে চলে যান, আর সেখানেই অবস্থান করছিলেন। মরহুম শহীদের বংশে তার দাদা জনাব নিজামুদ্দিন আহমদের মাধ্যমে আহমদিয়াতের আগমন হয় যিনি প্রথম খিলাফতকালে বয়আত করে আহমদিয়াত গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তার দাদার বড় দুই ভাই ছিলেন। ডাক্তার ফতেহ দ্বীন সাহেব, সিভিল সার্জন পেশোয়ার এবং ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল লতীফ সাহেব। ডাক্তার ফতেহ দ্বীন সাহেব ১৯০২ সালে ছাত্রজীবনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দাবির সংবাদ শুনে কাদিয়ান গিয়ে তাঁর (আ.) সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। হুযুর (আ.) স্নেহভরে তার গায়ে হাত রেখে বলেছিলেন, খুব ভালো বালক; যদিও তিনি বয়আত করতে পারেন নি। পরবর্তীতে তিনি বৃত্তি নিয়ে এখানে তথা যুক্তরাজ্যে আসেন এবং এখানে চিকিৎসা শাস্ত্রে উচ্চতর শিক্ষা অর্জন করেন। অতঃপর তিনি ১৯০৮ সালে হযরত মসীহ্ মওউদ

(আ.)-এর মৃত্যু সংবাদ শুনে কাদিয়ান গিয়ে প্রথম খিলাফতের যুগে বয়আত গ্রহণ করেন। তার দাদার আরেক ভাই আব্দুল লতীফ সাহেব ছিলেন একজন প্রকৌশলী। তিনিও প্রথম খিলাফতের যুগে তার ভাইয়ের সাথেই বয়আত গ্রহণ করেন। কয়েক দিন পর দুই ভাইয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়াতভুক্ত হয়; যাদের মধ্যে শহীদ মরহুমের দাদাও ছিলেন। শহীদ মরহুম অনেক গুণাবলীর আধার ছিলেন। খিলাফতের প্রতি তার সুগভীর ভালোবাসা ছিল। জামা'তের কর্মকর্তাদের সাথে তিনি যথেষ্ট আন্তরিকতার সম্পর্ক রাখতেন; তবলীগের গভীর আগ্রহ ছিল। এজন্য তাকে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিরও সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই প্রতিকূল পরিস্থিতির দরুন বিগত দুই বছরে তিনি সাত বার ঘর পরিবর্তন করেন, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে তিনি আহমদীয়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাহাজ্জুদ এবং নামায ছাড়াও কুরআন পাঠে তিনি খুবই নিয়মিত ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্নেহবৎসল, মিশুক প্রকৃতির আর জীবনভর কখনো কারো সাথে ঝগড়া-ঝাটি করেন নি। তার স্ত্রী বলেন, জীবনে বহু চড়াই-উতরাই এসেছে, কিন্তু তিনি কখনোই আগ্রাসী বা আক্রমণাত্মক ব্যবহার করেন নি। আর আমি তার সাথে কঠোরভাবে কথা বললেও তিনি সবসময় কোমলভাবে উত্তর দিতেন। সন্তানদের সাথে সর্বদা স্নেহ এবং ভালোবাসাপূর্ণ ব্যবহার করতেন। শাহাদাতের সুগভীর বাসনা রাখতেন। তিনি সবসময় বলতেন, কখনো যদি পরীক্ষার মুহূর্ত আসে তাহলে আহমদীয়া খিলাফতের সাথে বিচ্ছেদের পরিবর্তে আমি মৃত্যুকে প্রাধ্যান্য দিব। অতঃপর তিনি লিখেন, তার নামায পড়ার দৃষ্টান্ত এমন ছিল যে, কখনো কখনো সিজদারত অবস্থায় পরিবারের সদস্যরা তার গায়ে হাত দিয়ে দেখত যে, এত দীর্ঘক্ষণ ধরে সিজদাতে লুটিয়ে আছেন, আল্লাহ্ না করুন, পাছে আবার কিছু হয়ে যায়নি তো! শহীদ মরহুম বাযীদখেলে মুনতাযেম তরবিয়ত হিসেবেও জামা'তের কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। শহীদ মরহুম শোক সন্তপ্ত পরিবারে তার স্ত্রী সাজেদা কাদের সাহেবা ছাড়াও চার ছেলে এবং পাঁচ কন্যা রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা শহীদ মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার ছেড়ে যাওয়া পরিবারের তত্তাবধায়ক ও সাহায্যকারী হোন আর তার সন্তানসন্ততিদেরও মরহুমের সৎকর্ম অব্যাহত রাখার তৌফিক দান করুন।

দ্বিতীয় জানাযা হলো, ইব্রাহীম সাহেবের পুত্র আকবর আলী সাহেবের। তিনি আসীরে রাহে মওলা তথা ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে কারাশাস্তি ভোগ করেন। তিনি নানকানা জেলার অন্তর্গত শওকতাবাদ-এর অধিবাসী ছিলেন। তিনি গত ১৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে মৃত্যু বরণ করেন। আসীরে রাহে মওলা তথা বিশ্বাসের কারণে কারাশাস্তি ভোগকারী আকবর আলী সাহেব শেখুপুরা কারাগারে ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার আরও দু'জন সঙ্গী ছিলেন; ০২ মে ২০২০ তারিখে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল এবং অক্টোবর মাসে উচ্চ-আদালতে জামিন নিশ্চিতকরণের তারিখে আদালত তাদের অন্তর্বর্তীকালীন জামিন স্থগিত করে এবং গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দেয়। যাহোক, এই তিন সঙ্গী গ্রেপ্তার হন। এরপর নানকানার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব একটি আবেদনের প্রেক্ষিতে এক-তরফা শুনানি শেষে আমাদের বক্তব্য না শুনেই ২০২১ সনের জানুয়ারি মাসে ২৯৫-সি ধারাও যুক্ত করে দেয়, যা অত্যন্ত ভয়ংকর একটি ধারা। যাহোক, মরহুম সাড়ে চার মাস ধরে কারাবন্দি অবস্থায় ছিলেন; মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি ওসিয়্যত ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তার বংশে আহমদীয়াতের সূচনা তার পিতা মোকাররম ইব্রাহীম সাহেবের মাধ্যমে হয়েছিল, যিনি তার ভাই মোকাররম মিয়া ইসমাঈল সাহেবের সাথে ১৯২০ সালে দ্বিতীয় খিলাফতের যুগে বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। আকবর আলী সাহেব সেনাবাহিনীতে ভর্তি হন; ২৩ বছর সেনাবাহিনীতে হাবিলদার হিসেবে চাকরি করেন। ১৬ বছর পূর্বে সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং এরপর

নিরাপত্তাকর্মীর চাকুরি করতে থাকেন। অত্যন্ত দায়িত্বশীল ও সাহসী মানুষ ছিলেন। বন্দি হওয়ার পূর্বে ব্যাংকের নিরাপত্তাকর্মী হিসেবে চাকরি করছিলেন। সেই ব্যাংকের ম্যানেজারের কাছে একজন বিরুদ্ধবাদী অভিযোগ করে যে, আপনি আকবর আলীকে চাকরি দিয়ে রেখেছেন, সে তো কাফের! ব্যাংক ম্যানেজার উত্তরে বলেন, আমি প্রত্যেক দিন সকালে এসে সিসিটিভি রেকর্ডিং চেক করি। আকবর আলী রাতে নফল নামায পড়ে, তিলাওয়াত করে, রমজান মাসে রোযা রাখে। এই ব্যক্তি কাফের কীভাবে হতে পারে? যাহোক, ম্যানেজার খুব সাহসী কোন মানুষ ছিল। মরহুম জামা'তের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ছয় বছর সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। বন্দি হওয়ার পূর্বে সেক্রেটারী মাল হিসেবে কাজ করছিলেন। মরহুম দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল, অতিথিপরায়ণ হওয়ার পাশাপাশি পরিবারের সকল সদস্যের সাথে আন্তরিক ভালবাসাপূর্ণ সম্পর্ক রাখতেন। তবলীগের খুব আগ্রহ ছিল; সবসময় যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে কথা বলতেন, যার ফলে তাকে বিরোধিতাপূর্ণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হতো। নিরাপত্তাকর্মীর চাকুরিও বিরোধিতার কারণে ছেড়ে দিতে হয়। তিনি তার দুই বিধবা স্ত্রী যিনাত বিবি সাহেবা ও ফযিলত বিবি সাহেবা ছাড়া উনিশ বছরের এক পুত্র এবং ষোল বছরের এক কন্যা রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ আচরণ করুন এবং তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন; তার সন্তানদের নিরাপত্তা বিধান করুন ও সাহায্যকারী হোন এবং তাদেরকে মরহুমের পুণ্যসমূহ অব্যাহত রাখার সৌভাগ্য দিন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হবে খালেদ মাহমুদুল হাসান ভাট্টি সাহেবের। সম্প্রতি তিনি রাবওয়ায় তাহরীকে জাদীদের ওকিলুল মাল সালেস ছিলেন; অনুরূপভাবে আনসারুল্লাহ্র নায়েব সদরও ছিলেন এবং জলসা সালানার নায়েব অফিসারও ছিলেন। তাহের হার্ট ইন্সটিটিউটে ৬৭ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ। তার দাদা বাবুল খান ভাট্টি সাহেব আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু খালেদ মাহমুদুল হাসান ভাট্টি সাহেবের পিতা আহমদীয়াত গ্রহণ করেন নি; তিনি আহমদীয়াতের সত্যতার বিষয়ে আশ্বস্ত ছিলেন না। তার পিতা (অর্থাৎ মরহুমের দাদা) বয়আত গ্রহণ করেন, কিন্তু পুত্র (মরহুমের পিতা) বয়আত করেন নি। যাহোক, তিনি কৃষিকাজ করতেন; একদিন খামার বাড়িতে বসেছিলেন; খালেদ মাহমুদুল হাসান সাহেবের পিতাও সেখানেই চাদর বিছিয়ে শুয়ে ছিলেন। তার পিতা যে অ-আহমদী মৌলভীর মসজিদে নামায পড়তে যেতেন, সে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল; সে-ও বসে পড়ে এবং আলাপচারিতার বিষয় গড়ায় আহমদীয়াত নিয়ে। মৌলভী সাহেব বলে, অর্থাৎ কথা প্রসঙ্গে মৌলভী একথা স্বীকার করে নেয় যে, 'আহমদীয়াত সত্য'। এতে তার পিতা তৎক্ষণাৎ নিজের মুখ থেকে চাদর সরিয়ে উঠে বসেন এবং বলেন, আহমদীয়াত যদি সত্য হয়, তাহলে আমাদেরকে ভুলপথে কেন পরিচালিত কর? তুমি তো আমাকে পথভ্রষ্ট করে বল যে, আহমদীয়াত মিথ্যা, এটি গ্রহণ করো না আর তোমার পিতার অনুসরণ করো না! যাহোক, তিনি বলেন ভালো করে শুনে নাও, সত্য যেদিকে আজ থেকে আমিও সেদিকেই আছি। অতঃপর তিনি গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণ করেন। খালেদ মাহমুদুল হাসান ভাট্টি সাহেব ১৯৭৮ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বি.এ. করার পর এম.এ. করেন এবং ১৯৮০ সালে ইতিহাস বিষয়ে এম.এ. সম্পন্ন করেন। তারপর দুই বছর প্রভাষক হিসাবে সরকারী চাকরি করেন। দুই বছর পর পদত্যাগ করেন। ১৯৮২ সালে জীবন উৎসর্গ করেন। তিনি ৩৮ বছর বিভিন্ন পদে জামা'তের কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। ১৯৮২ সালে ওকালতে তামীল ও তানফিযে তাকে নিযুক্ত করা হয়। এরপর তিনি নায়েব ওকীলও ছিলেন এবং পরে ওকীলুদ্ দিওয়ানও নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে তিনি ওকীলুল মাল সালেস ছিলেন। তিনি ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, বার্মা, শ্রীলংকা, নেপাল, উগান্ডা ও অন্যান্য স্থানেও সফর করেছেন। যেখানেই সফরে যেতেন খুবই সূক্ষ্মদৃষ্টিকোণ থেকে

পর্যালোচনা করতেন এবং তদনুযায়ী তাদের নির্দেশনা প্রদান করতেন। তিনি যে জামা'তেই গিয়েছেন, বিশেষভাবে বার্মা এবং শ্রীলংকার জামা'ত তার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছে। সেখানকার জামা'তের কয়েকজন আমার কাছে লিখিতভাবে এটি স্বীকারও করেছেন যে, আমরা অনেক কিছু শিখেছি আর জামা'তের ব্যবস্থাপনার সঠিক ধারণা আমাদেরকে ভাট্টি সাহেব দিয়েছেন। খিলাফতের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। একইভাবে তিনি খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং আনাসারুল্লাহ্র কেন্দ্রীয় আমেলা এবং বিভিন্ন কমিটিরও সদস্য ছিলেন। মরহুম কাযা বোর্ডেরও সদস্য ছিলেন। তার স্ত্রী নুসরাত নাহিদ সাহেবাকে আল্লাহ্ তা'লা দুই মেয়ে এবং এক ছেলে সন্তান দান করেছেন। তার পুত্র খুররাম উসমান সাহেব ওয়াকফে জিন্দেগী, আমাদের এখানে যুক্তরাজ্যের এম.টি.এ.-তে কাজ করছেন। মরহুমের স্ত্রী বলেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম.এ. সম্পন্ন করার পর তিনি নিজ পিতাকে বলেন আমি ইতিহাসেও এম.এ. করতে চাই। তার পিতা উত্তরে বলেন, যত পড়ালেখা করতে চাও কর, কিন্তু মনে রাখবে, চাকরি যদি করতেই হয় তাহলে জামা'তের চাকরিই করো। মরহুমের স্ত্রী বলেন, ৪৩ বছরের দাম্পত্য জীবনে সর্বদা স্নেহ-ভালোবাসার ব্যবহার করেছেন। সফর থেকে যখনই তিনি ফিরে আসতেন বিভিন্ন ঘটনা শোনাতেন যে, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ভালোবাসাপূর্ণ ব্যবহার করেছেন। সন্তানদের জন্য তিনি একজন স্নেহশীল পিতা ছিলেন। সন্তানদের সকল বৈধ আবদার পূরণের চেষ্টা করতেন। তার বড় মেয়ে ডাক্তার সায়মা বলেন, আমি ভিসার জন্য আবেদন করেছিলাম, দু'বার তা প্রত্যাখ্যাত হয়। তৃতীয়বার পুনরায় আমি আবেদন করি। তখন ভাট্টি সাহেব বাহিরে কোথাও সফরে যাচ্ছিলেন। তখন মেয়ে বলেন, আপনি সফর কয়েকদিন পিছিয়ে নিন, কেননা সামনে ভিসার তারিখ রয়েছে, দূতাবাসে যেতে হবে। এতে তিনি বলেন, এটি সম্ভব নয়; তুমি একা-ই যাও, কেননা আমি খোদা তা'লার খাতিরে এই সফরে যাচ্ছি; আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করবেন। সেবার এই মেয়ে ভিসা পেয়ে যায়। মরহুমের ছোট মেয়ে বলেন, অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের অধিকারী পিতা ছিলেন, খুবই কোমলতাপূর্ণ আচরণ করতেন। আমাদের কখনো ধমক দেন নি, অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে আমাদের বুঝাতেন। জামা'তের কাজকে সর্বদা প্রাধান্য দিতেন। ঘরের কাজ যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন প্রথমে অফিসের কাজ শেষ করে তবেই ঘরে ফিরতেন। সর্বদা জামা'তের সেবা করার জন্য প্রস্তুত থাকতেন। ভালোবাসা ও আন্তরিকতার সাথে জামা'তী কাজ করতেন। ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিতেন। আমি নিজেও দেখেছি যে, অত্যন্ত পরিশ্রমের সাথে তিনি কাজ করতেন। অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে এবং ওয়াক্‌ফের চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে সর্বদা জামা'তের কাজ করেছেন। তার এক মেয়ে বলেন, যখনই কোন কঠিন সময় এসেছে, সর্বদা তিনি আমাদেরকে খোদা তা'লার ওপর ভরসা রাখার উপদেশ দিতেন আর সর্বদা এ কথাই বলতেন যে, আল্লাহ্ তা'লা কখনো তোমাদের পরিত্যাগ করবেন না। আল্লাহ্ তা'লা কখনো আমাদের পরিত্যাগ করেন-ও নি। তার পুত্র বলেন, আমরা যখন থেকে বুঝতে শিখেছি তখন থেকেই তাকে জামা'তের কাজ করতে দেখেছি। যখনই কোন কঠিন সময় উপস্থিত হতো বা কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হতেন, সর্বদা এ কথাই বলতেন যে, আমি যেহেতু ধর্মের কাজ করছি, আল্লাহ্ তা'লার কাজ করছি তাই আল্লাহ আমার কাজ করে দিবেন। পরবর্তীতে আল্লাহ্ তালাও কৃপা করেন আর তার কাজও সহজ হয়ে যায়। সত্যিকার অর্থে তিনি ওয়াকফের চেতনায় উজ্জীবিত ছিলেন। কিন্তু একই সাথে তিনি এটিও বলেন যে, জামা'তী শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি ঘরের সমস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে কখনো ত্রুটি করেন নি। প্রতিটি জিনিসের দেখাশোনা তিনি নিজে করতেন। তাহরীকে জাদীদের আইন বিষয়ক উপদেষ্টা হলেন, লাঈক আবেদ সাহেব। তিনি বলেন, সুদীর্ঘ ৩৮ বছর আমি তার সাথে কাজ করেছি। তিনি জামা'তী রীতিনীতির রক্ষক ছিলেন এবং সেগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। অনেক গুণের মাঝে তার

একটি গুণ হলো তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মতার সাথে জামা'তের ধনসম্পদের হিফাযত করাকেও অতীব জরুরী মনে করতেন। তার এক সহপাঠী মুহাম্মদ ইদ্রিস সাহেব বলেন, ওয়াক্‌ফ করার পর সে স্বল্পভাষী খালেদ এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বরূপে সামনে আসে। খিলাফতের প্রতি ভালোবাসার বিষয়টি হয়ত তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রবহমান হয়ে গিয়েছিল। যুগ-খলীফার আনুগত্য করা তার প্রাত্যহিক জীবন ছিল। সর্বদা ধর্মসেবায় মগ্ন থাকা তার প্রিয় খোরাকে পরিণত হয়েছিল। ওকালতে মাল সালেস-এর এক কর্মী বলেন, অফিসে যে চিঠিই আসত তা ফেলে রাখতেন না, তাৎক্ষণিকভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন। এছাড়া আমাদের জন্য নির্দেশনা ছিল, আজকের কাজ আজই করবে, জীবনের কোন বিশ্বাস নেই, আগামীকাল সুযোগ আসবে কিনা তার কোন নিশ্চয়তা নেই। যেভাবে আমি বলেছি, পাকিস্তানের অভ্যন্তরে এবং বহির্বিশ্বে যেখানেই গিয়েছেন খুবই ভালো প্রভাব ফেলেছেন আর সেবার চেতনা নিয়ে কাজ করেছেন এবং অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে ওয়াক্‌ফের দায়িত্ব পালন করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যদা উন্নীত করুন এবং তার সন্তানসন্ততিকেও তার পুণ্য সমূহ ধরে রাখার সৌভাগ্য দিন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আইন বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব মোবারক আহমদ তাহের সাহেবের। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে তাহের হার্ট ইনস্টিটিউটে ৮১ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার পিতা শ্রদ্ধেয় সূফী গোলাম মুহাম্মদ সাহেবের মাধ্যমে ১৯২৭ সনে তাদের বংশে আহমদীয়াত আসে বা প্রবেশ করে। কাদিয়ানে জামা'ত প্রতিষ্ঠার বিষয়টি জানার পর তিনি তার আত্মীয়স্বজনের সাথে কাদিয়ান যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। অতএব ১৯২৬ সনে তিনি সিন্ধুর থারপার্কার হতে জলসায় যোগদানের উদ্দেশ্যে কাদিয়ান যান। সেখানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এবং জামা'তকে দেখে খুব প্রভাবিত হলেও বয়আত করেন নি। পরবর্তী বছর পুনরায় তিনি (কাদিয়ান যাওয়ার) নিয়ত করেন কিন্তু অন্য সঙ্গীরা অস্বীকৃতি জানায়। যাহোক পরের বছর ১৯২৭ সনে তিনি সেখানে গিয়ে জলসা শুনেন আর এরপর বয়আত করেন, তখন তার বয়স ছিল ২৮ বছর। তার গ্রাম ছিল কট্টর আহলে হাদীসপন্থি। তার ভীষণ বিরোধিতা হয়। শ্বশুড়বাড়ির লোকেরা তাকে কাফের আখ্যা দিয়ে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। যাহোক, কিছু দিন পর তার স্ত্রী বলেন, আমি তাকে দেখেছি কাফের হওয়ার পর তিনি পূর্বের চেয়ে আরো ভালো মুসলমান হয়ে গেছেন, তাই তিনি ফিরে আসেন এবং বলেন, আমি মনে করি না যে, পৃথক থাকার মতো কোন কারণ আছে। যাহোক, পুরো গ্রাম এই পরিবারকে বয়কট করে। এমনকি গ্রামের কূপ থেকে তাদের পানি নেয়া বন্ধ করে দেয়। (তখন) কয়েক মাইল দূরে গিয়ে পানি আনতে হতো। তিনি বলেন, কয়েক সপ্তাহ অতিবাহিত হওয়ার পর সেই গ্রামের কূপের পানি শুকিয়ে যায়। এরপর গ্রামবাসীর মনে পড়ে যে, আমরা সূফী সাহেবের পানি বন্ধ করে দিয়েছিলাম, এজন্য আমাদের গ্রামের পানিও বন্ধ হয়ে গেছে। অতঃপর তারা যখন পুনরায় কূপ খনন করতে আরম্ভ করে তখন তারা তার কাছে এসে বলে, সর্বপ্রথম চাঁদা আপনি দিন, কেননা আপনি এই কাজে চাঁদা দিলে কূপে পানিও বের হবে আর তা প্রবহমানও থাকবে। যাহোক, তার আত্মীয়স্বজন আহমদীয়াত গ্রহণ না করলেও এ ঘটনার পর থেকে বিরোধিতা বন্ধ করে দেয়। তার সহধর্মিণী হলেন রাশেদা পারভীন সাহেবা। আল্লাহ্ তা'লা তাকে ৪জন পুত্রসন্তান এবং ২জন কন্যাসন্তান দান করেছেন। তার এক পুত্র হাফেয এজায আহমদ তাহের সাহেব এখানে ইসলামাবাদে থাকেন এবং জামেয়া আহমদীয়া, যুক্তরাজ্যে শিক্ষকতা করেন। দ্বিতীয় পুত্র নাসের আহমদ তাহের সাহেব ওয়াকফে জিন্দেগী। তিনি রিভিউ অফ রিলিজিয়ন, কানাডায় কাজ করছেন। জনাব মোবারক তাহের সাহেবও ১৯৬৮ সালে অর্থনীতিতে এম.এ. করেন। এরপর ১৯৬৯ সালে এল.এল.বি. ডিগ্রী অর্জন করেন এবং ১৯৭০ সালের জানুয়ারি মাসে তার ওয়াক্‌ফ মঞ্জুর হয়। এল.এল.বি. এবং এম.এ. করার পর ওকালতে উলিয়ায় প্রথম শ্রেণির করণিক হিসেবে তার নিযুক্তি হয়। এরপর

১৯৭১ সালের ০৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে তাকে শিক্ষক হিসেবে উগান্ডায় প্রেরণ করা হয়। ১৯৭২ সালে তিনি সেখান থেকে ফিরে আসেন। এরপর ওকালতে মাল সানী-তেও কিছুকাল দায়িত্ব পালন করার সৌভাগ্য পান। অতঃপর ১৯৭৬ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তাকে লাহোরে বিভিন্ন উকীলের সাথে আয়কর এবং জমিজমা- সংক্রান্ত কাজের প্রশিক্ষণ নিতে বলেন। তিনি বার কাউন্সিলেরও সদস্য হন। ১৯৭০ সালে তাকে তাহরীকে জাদীদের আইন উপদেষ্টা নিযুক্ত করা হয়। ১৯৮৩ সালের ০১ জুলাই তারিখে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাকে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আইন বিষয়ক উপদেষ্টার দায়িত্বও প্রদান করেন। তিনি আমৃত্যু উক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। ৫০ বছরেরও অধিক কাল তিনি জামা'তের কাজ করে গেছেন। কেন্দ্রীয় খোদ্দামুল আহমদীয়ার বিভিন্ন পদে তিনি মোহতামীম হিসেবে দায়িত্ব পালনের তৌফিক পেয়েছেন। তার স্ত্রী রাশেদা পারভীন সাহেবা বলেন, সর্বদা তিনি হাস্যবদনে গৃহে প্রবেশ করতেন, সালাম বিনিময় করতেন এবং প্রথমে নামায পড়তেন আর এরপর খাবার খেতেন। তিনি আরো বলেন, সকল খলীফার সাথেই তার স্মৃতিবিজড়িত বহু ঘটনা ছিল আর যখন তিনি নিজ পরিবারের ছেলেমেয়ের সাথে বসতেন তখন তাদেরকে ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শুনাতেন, খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও পুরস্কাররাজি লাভ হওয়ার কথা বলতেন। নীরবে অভাবীদের সাহায্য করতেন, এমনকি আমরাও টের পেতাম না। সাহায্য গ্রহীতা নিজে থেকে এসে বলে গেলে বা কোনভাবে অবগত করলে আমরা জানতে পারতাম। অন্যের দুঃখে দুঃখী এবং আনন্দে আনন্দিত হতেন। নফল নামায পড়তেন, কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং দরূদ শরীফ পড়তেন। তিনি বলতেন, ওয়াকফে জিন্দেগীর কাজের সফলতার দায়িত্ব খোদা নিজের হাতে নিয়ে নেন। খোদার ওপর ভরসা রাখুন, দোয়া ও ইস্তেগফার করুন, খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করুন এবং দোয়ার আবেদন জানিয়ে যুগ-খলীফকে পত্র লিখুন- এগুলো খুবই জরুরী বিষয়। এ সবগুলো কথাই সত্য কথা। তার মাঝে খোদার প্রতি গভীর আস্থা ছিল। আমি যখন নাযেরে আলা ছিলাম তখনও দেখেছি এবং এর পূর্বেও তার সাথে কিছু কাজ করতে গিয়ে দেখেছি যে, তার খোদানির্ভরতা ছিল অতি উন্নত মানের। তিনি বলতেন, জামা'তের কাজ আর যুগ-খলীফার দোয়া সাথে আছে, তাই হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ্। সদকা, খয়রাত এবং দোয়ার মাধ্যমে কাজ আরম্ভ করতেন আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সফলতাও লাভ করতেন। তার পুত্র হাফেয এজায সাহেব লিখেন, তিনি একটি ঘটনা শুনিয়েছেন যে, ১৯৬৭ সালে একবার হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) ট্রেনে করাচী যাচ্ছিলেন। হায়দ্রাবাদ স্টেশনে কিছুক্ষণের জন্য ট্রেন থামে। বহু সংখ্যক আহমদী সদস্য হুযূরের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে সেখানে আসে। হুযূর (রাহে.) ট্রেনের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন আর হাতের ইশারায় তিনি জনাব মোবারক তাহের সাহেবকে ডাকেন। ইতিপূর্বে তার সাথে হুযূরের কোন পরিচয় ছিল না। কমপক্ষে তার এ ধারণা ছিল যে, হুযূর (রাহে.) তাকে চিনেন না। যাহোক, তিনি বলেন, ভিড়ের মধ্যে মোবারক তাহের সাহেব হুযূরের দিকে এগিয়ে যান আর দরজার নিকটে পৌঁছার পর হুযূর (রাহে.) তাঁর শেরওয়ানীর পকেট থেকে কিছু অর্থ বের করে মোবারক তাহের সাহেবের পকেটে ঢুকিয়ে দেন। এরপর ট্রেন চলে যায়। মোবারক সাহেব প্রায়শই বলতেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) যে অর্থ আমার পকেটে দিয়েছিলেন তার কল্যাণে সর্বদা আমার পকেট ভরা থাকে আর এটিই বাস্তবতা। আল্লাহ্ তা'লা তার পকেট সর্বদা ভরা রেখেছেন আর তার কতিপয় উপার্জন অস্বাভাবিকভাবে হতো। এভাবেই তিনি সে অর্থ দরিদ্রদের জন্য ব্যয় করতেন। জামা'তের জন্যও তিনি অনেক ব্যয় করতেন। যাহোক, কিছুকাল পর তিনি একটি স্বপ্নের ভিত্তিতে জীবন উৎসর্গ করেন।

তিনি যখন জীবন উৎসর্গ করেন তখন তার বিয়ে ঠিক হয়েছিল আর নিকাহও পড়ানো হয়েছিল। তিনি হায়দ্রাবাদে থাকতেন। এক আত্মীয়া তার স্ত্রীকে চিকিৎসা করানোর জন্য নিয়ে আসে এবং তাকেও বলেন যে, ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। ট্রেন থেকে নামার পর সেই আত্মীয়া বলে বসেন যে, শুনেছি আপনি নাকি ধর্মের উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করেছেন? যারা জীবন উৎসর্গ করে তাদের তো খাবারের পয়সাও জুটে না। মোবারক সাহেব তৎক্ষণাৎ বলেন, আমাদের তো শুধু নিকাহ্ হয়েছে, এখনো মেয়ে উঠিয়ে নেয়া হয় নি। আপনাদের যদি এতই সন্দেহ থাকে তাহলে আপনারা চাইলে আপনাদের মেয়েকে নিজ ঘরে রেখে দিতে পারেন। একথা বলে রাগ করে তিনি সেখান থেকে চলে যান। যাহোক, তিনি আত্মাভিমান প্রদর্শন করেন আর আল্লাহ্ তা'লাও তার আত্মাভিমানের মর্যাদা রেখেছেন। কেননা ওয়াক্ফ থাকা অবস্থায়ও আল্লাহ্ তা'লা তাকে অঢেল ধনসম্পদের অধিকারী করেছিলেন। বেশ অর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল তার। খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর যুগে তিনি আইন বিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন। মামলার জন্য শহরের বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ত এবং বাসে সফর করতে হতো। তখন রাবওয়াতে সফরের জন্য সবার কাছে গাড়ির সুবিধা ছিল না। খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর নির্দেশ ছিল যখনই সফর থেকে ফিরবে, সবার আগে আমার কাছে এসে রিপোর্ট করবে। একবার ফিরতে অনেক রাত হয়ে যায়। তিনি বলেন, ফজরের নামাযের ২ ঘন্টা পূর্বে রাবওয়া পৌঁছি, তাই আমি ভাবি, এখন গিয়ে খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-কে সংবাদ দিলে (তার) রাতের ঘুম নষ্ট হবে, তাই এটি ঠিক হবে না। তিনি হয়ত ঘুমুচ্ছেন অথবা নফল নামায পড়ছেন। যাহোক, (ফজরের নামাযের) দুই ঘন্টা পূর্বে আমি পৌঁছি, তাই আমি চিন্তা করি, ফজরের নামাযে গিয়ে সংবাদ দিব। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তাকে ফজরের নামাযে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করেন, মোবারক সাহেব রাতে কখন ফিরলেন? আমি উত্তরে বলি, হুযূর! দেড়-দুই ঘন্টা পূর্বে পৌঁছেছি। এটি শুনে হুযূর (রাহে.) বলেন, তুমি যদি আসা মাত্রই আমাকে জানিয়ে দিতে তাহলে আমিও কিছুক্ষণ ঘুমাতে পারতাম। তোমার জন্য আমি অপেক্ষা করছিলাম, সফর শেষে ভালোভাবে পৌঁছলে কিনা– এটি নিয়ে চিন্তা করছিলাম।

এরপর তাঁর পুত্র লিখেন, আমি যখন ওয়াক্ফ (জীবন উৎসর্গ) করার ইচ্ছা করি, অর্থাৎ জামেয়ায় যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করি তখন তিনি আমাকে বলেন, ওয়াক্ফ হলো আনুগত্যের আরেক নাম। তুমি কিছুটা রাগী স্বভাবের, এভাবে ওয়াক্ফ করা যায় না। ওয়াক্ফ তো কেবল নীরবতা অবলম্বন ও আনুগত্যের সাথে দায়িত্ব পালনের নাম। তুমি যদি এমনটি করতে পার তাহলে অত্যন্ত খুশির কথা, নতুবা আমার এটি পছন্দ নয় যে, একবার জীবন উৎসর্গ করবে আর পরে গিয়ে তা ছেড়ে দিবে। এভাবে তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন এবং তরবিয়ত করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এখন পর্যন্ত সেই পুত্র দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য পাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতেও পেতে থাকুন।

যুগ-খলীফার খুতবার সময় পরিবারের সদস্যদের জন্য নির্দেশ ছিল, খুতবার সময় সব কাজ ছেড়ে দিয়ে মনোযোগের সাথে খুতবা শ্রবণ কর। কোন উপদেশ, নির্দেশনা কিংবা আর্থিক তাহরীক করা হলে খুতবা সমাপ্ত হতেই সেই আহবানে সাড়া দিতেন এবং পাশাপাশি সন্তানদেরও নির্দেশ দিতেন।

আঞ্জুমানে তাঁর সহকারী আইন উপদেষ্টা মির্যা আদিল আহমদ সাহেব লিখেন, আমি যতদূর লক্ষ্য করে দেখেছি, তিনি খিলাফতের সত্যিকার প্রেমিক ছিলেন। দোয়ার প্রতি তার অটল বিশ্বাস ছিল। কোন দুশ্চিন্তা বা উৎকণ্ঠা দেখা দিলে, কিংবা খুব বেশি কঠিন কাজের জন্য তাকে যেতে হলে তিনি বলতেন, নফল নামাযে অনেক দোয়া করেছি, সদকাও দিয়েছি, যুগ খলীফার সমীপে (দোয়ার জন্য) লিখেছি, (এখন) দেখো! আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করবেন। তিনি বলেন, খুবই আত্মাভিমানী মানুষ ছিলেন। কিন্তু জামা'তের জন্য কোন দপ্তরের চা প্রস্তুতকারী

কিংবা সাহায্যকারী কর্মীর সাহায্য করতে হলেও কোন ধরনের অসম্মান বোধ করতেন না এবং কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগের জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার মাধ্যম অবলম্বন করতেন।

একবার আঞ্জুমানের পক্ষ থেকে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। তাঁর মতে, সেই সিদ্ধান্তে আমল করা হলে জামা'তের ওপর মন্দ প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা ছিল বা জামা'তের ওপর এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ার আশঙ্কা ছিল। তিনি আমাকে বলেন, এ সিদ্ধান্তটি সঠিক মনে হচ্ছে না। কিন্তু পুনরায় তিনি বলেন, যুগ-খলীফাকে আমরা আমাদের মতামত লিখে জানাচ্ছি। আমাদের কাজ হলো যুগ-খলীফার নিকট আমাদের মতামত পৌঁছানো। এরপর তিনি যে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন তাতেই কল্যাণ নিহিত থাকবে।

ডাক্তার সুলতান মুবাশ্বের সাহেব বলেন, তার মাঝে কর্মকর্তাদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ার বিশেষ দক্ষতা ছিল। এ সম্পর্ককে তিনি সর্বদা জামা'তের স্বার্থে ব্যবহার করেছেন। কঠিন থেকে কঠিনতর পরিস্থিতিতেও তার মুখে সর্বদা হাসি লেগে থাকত। তার চেহারায় কখনো ভয়ভীতির চিহ্ন দেখা যেত না। জামা'তের বিভিন্ন মামলার কাজে এমনসব স্থানেও যেতে হতো যেখানে বিভিন্ন ধরনের বিপদের সম্ভাবনা ছাড়া জীবনের জন্যও হুমকি থাকত। কিন্তু এই বীরপুরুষ কখনোই স্বীয় আবশ্যক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে গা বাঁচিয়ে চলেন নি। এছাড়া যেমনটি আমি বলেছি, আল্লাহ্ তা'লা তাকে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যও দান করেছিলেন। বন্ড-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা তাকে অনেক সাহায্য করতেন। তিনি অনেক বড় বড় অংকের লটারি পেতেন। ডাক্তার সাহেব বলেন, একবার তিনি পঞ্চাশ লাখ টাকার পুরস্কার পেয়েছিলেন। তা থেকে প্রায় ৬০ শতাংশ বিভিন্ন খাতে এবং দরিদ্রদের সাহায্যের জন্য দান করে দেন। এটি কেবল একবারেরই ঘটনা নয়, বরং সবসময়ই তার এ নীতি ছিল। আল্লাহ্ তা'লা বড় বড় অংকের অর্থ দান করতেন আর সেখান থেকে মোটা অংকের অর্থ তিনি চাঁদা এবং দরিদ্র লোকদের সাহায্য সহযোগিতার জন্য দিয়ে দিতেন। তিনি বলেন, তার বড় বড় দুটি আকাঙ্ক্ষা ছিল। সেজন্য দোয়ার আবেদনও জানাতেন। এর একটি হলো আজীবন জামা'তের সেবা করতে পারা এবং অপরটি হলো সচল থাকা অবস্থায় পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পারা, যেন কারো ওপর বোঝা হয়ে থাকতে না হয়। আল্লাহ্ তা'লা তার এ দুটি ইচ্ছাই পূর্ণ করেছেন। আমি দেখেছি, তার মাঝে অগণিত আরো অনেক গুণ ছিল। খুবই ধৈর্য্য ও মনোবলের সাথে কাজ করতেন। কখনো অস্থির হতেন না। আল্লাহ্ তা'লার ওপর অসাধারণ ভরসা ছিল। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার বংশধরদের তার দোয়ার উত্তরাধিকারী করুন।

নামাযের পর আমি এদের সবার গায়েবানা জানাযার নামায পড়াব, ইনশাআল্লাহ্।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)